Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 51-65
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নমঃশূদ্র জাগরণ: গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া আন্দোলন

অনন্ত কুমার মণ্ডল
শিক্ষক, কোন্নগর নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বিদ্যামন্দির, হুগলী এবং
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত, উঃ ২৪ পরগণা

Abstract

In the post meeting period in India, the British rulers had just threw away the policy of non-interference in the religious and social sectors and rather followed the direct interference policy in respect of the age-caste system herein. Their only driving force in this field was the infamous 'Divide and Rule' policy helpful for their vested interest. They clearly felt that, in order to lengthen their ruling over this country, they have to give a new shape to the racial difference so fondly nurtured here. And once game was handed over, they most consciously broke the Hindu backbone in two. A part of Hindus are identified as 'Bonafide Hindu' and the other one as 'Scheduled Caste'. This resulted in a clear discrimination of higher and lower caste in a same society causing unstoppable clashes between those. Now to accelerate the racial enimity British rulers had another card under their sleeves – they most cunningly extended co-operating hands to the scheduled caste community. However, the dawn of the 20th Century found the downtrodden races of India to be politicalised and as such some of their power-greedy leaders utterly lent upon the rulers for their support and helps.

হরিচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরসূরি গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত মতুয়া ধর্ম প্রায় সমগ্র বাংলায় নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষদের মধ্যে এক নবচেতনার জন্ম দিয়েছিল। মতুয়া ধর্মানুসারী এবং মতুয়া আন্দোলনের সমর্থকগণ এই নবচেতনাকে 'রেনেসাঁ' রূপে চিহ্নিতকরণের পক্ষপাতী। কেউ কেউ আবার তাদের এই উত্থানকে স্পষ্টতই 'মতুয়া নবজাগরণ' নামে অভিহিত করেছেন। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই নবজাগরণ সংঘটিত হয়েছিল। হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা ও উদারনৈতিক চিন্তাভাবনার জন্যই এই নবজাগরণ দর্শন করেছিল বাস্তবে মুখ। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে যে মতুয়া আন্দোলন দুর্বার গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল তার প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলে হরিচাঁদ ঠাকুর। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সফলডাঙ্গা গ্রামে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জমিদারের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে তিনি সফলডাঙ্গা গ্রাম পরিত্যাগ করে ওড়াকান্দি গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। সমাজে যারা অন্ত্যজ অস্পৃশ্য, নিরক্ষর, পরাধীন সেই সমস্ত মানুষের মুক্তির জন্য, তাদের উন্নয়নের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। তঁর এই মুক্তির অর্থ কখনোই আধ্যাত্ম জীবনে উত্তরণ ছিল না, তা ছিল পার্থিব জীবনে অর্থ, সম্মান, মর্যাদা, শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রাপ্তি।[১] কোন নতুন চেতনা, মতবাদ বা আন্দোলনের জন্মদান বা পৃষ্ঠপোষকতাদানের মধ্য দিয়ে তার মূল জনমানসে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় না বা সাধারণ মানুশের মধ্যে প্রসার লাভ করে না। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একজন সুদক্ষ সংগঠক। শ্রীচৈতন্যদেবের ছিলেন নিত্যানন্দ,

তৃণমূলস্তরে যার জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক। বৈষ্ণব আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে তিনি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী ও সুপণ্ডিত। রামশরণ পাল ও সতীমার একমাত্র সন্তান ছিলেন রামদুলাল ওরফে দুলালচাঁদ। দুলাল চাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতায় কর্তাভজা সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়ে এক বিশাল আকার ধারণ করেছিল। অনুরূপভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র মনীষী গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন যথেষ্ট বড় মাপের মানুষ এবং তাঁর ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা। তাঁর সময়েই মতুয়া আন্দোলন জনপ্রিয়তার চূড়ায় উন্নীত হয়েছিল।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি গ্রামে। হীনমন্যতাবোধ মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না। হীনমন্যতা বিদূরীতকরণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা- এরূপ বোধের দ্বারা পরিচালিত হতেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাঁর মনে এই ধারণা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল যে শিক্ষালাভের মধ্য দিয়েই সমকক্ষ বা সমমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ওঠা সম্ভবপর।[২] অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা অর্জন করা যায়। আর অর্থনৈতিক উন্নতির সোপান হল শিক্ষা। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। সহজ সরল মতুয়া ধর্মের চেতনার জোয়ারে ঘুমন্ত ও অবহেলিত চণ্ডাল জাতির জীবনে ইতিপূর্বে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে। তিনি যুক্তিবাদ ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতে অতীত বিস্মৃত এই অবদমিত ও অবহেলিত সমাজের মানুষদের একইসূত্রে গ্রথিতকরণের কার্যটি সম্পাদন করতে পেরেছিলেন মাত্র। তাদের সার্বিক বিকাশের দায়িত্ব মৃত্যুর পূর্বে তিনি তুলে দিয়েছিলেন তাঁরই যথাযোগ্য ও সার্থক উত্তরপুরুষ গুরুচাঁদ ঠাকুরের উপর। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার নির্দেশমতো অনুন্নত সমাজে শিক্ষাবিস্তারের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পিতার মৃত্যুর সময় গুরুচাঁদ ঠাকুরের বয়স ছিল মাত্র বত্রিশ বছর। তদানীন্তন সময়ে অধিকাংশ শিক্ষায়তন ছিল উচ্চবর্ণসম্ভূত মানুষদের নিয়ন্ত্রনাধীন। এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষাগ্রহণের কোনরূপ অধিকার ছিল না। এমনকি গুরুচাঁদ ঠাকুরও তাদের পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন নি। পদ্মবিলার সাধু দশরথ ও মোল্লার কান্দির গোলক কীর্তনীয়ার কাছে বাল্য শিক্ষা এবং আড়কান্দি গ্রামের মক্তব থেকে শিখেছিলেন আরবী ও ফারসি ভাষা। আড়কান্দির মোকুব মিঞার কাছ থেকে তিনি ফারসি ভাষা শিক্ষার পাঠগ্রহণ করেছিলেন। পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে গিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুর সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, অন্ত্যজ জাতির মানুষদের উন্নতি সাধন করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণের জন্য তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নিজ গৃহে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার মাধ্য আরম্ভ করেন শিক্ষা আন্দোলন। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপনের জন্য তাঁর স্লোগান ছিল:

"বাঁচি কিংবা মরি তাতে ক্ষতি নেই।
গ্রামে গ্রামে পাঠশালা গড়ে তোলা চাই।"[৩]

আন্দোলন শব্দের অর্থ আলোড়ন বা বিক্ষোভ অথবা কোন লক্ষ্য সিদ্ধির জন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মূর্ত প্রকাস্য যেখানে যত আন্দোলন হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেদের আত্মসমান প্রতিষ্ঠার লড়াই। অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যে কোন আন্দোলনের নেপুথ্যে প্রায়শই ধর্ম বা ধর্মীয় চেতনা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চায় দেখানো হয়েছে যে, নিম্নগর্গের চৈতন্যের যে লক্ষণটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল ধর্মভাব। রনজিৎ গুহ লিখেছেন, "ধর্মভাব বলতে আমি শুধু ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্য বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি চেতনার সেই ঐতরিক যা 'Alienated' অবস্থার কথা যার প্রভাবে জড়জগৎ বা জীবজগতের কোন সত্তাকে, বাস্তবের বা ভাবনার অন্তর্গত কোন বিষয়কে তা যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আনতে পারে না, এবং এক বিষয়ের উপর আর এক বিষয়ের গুণ আরোপ করে। ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয়, যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়। ঐতরিকতার আতিশয্যেই কর্তা কখনো কখনো নিজের সৃষ্টিকে সঠিকভাবে চিনতে পারে না। যা তার নিজের

প্রতিভাজাত তাকে সে অন্যের কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করে।[৪] এই ধরনের ধর্মভাব নিম্নবর্ণীয় ও নিম্নবর্গীয় রাজনীতির একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। গুরুচাঁদ ঠাকুর পরিচালিত মতুয়া আন্দোলনেও এর কোনরূপ ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না। মতুয়াপন্থী লেখকরা এই আন্দোলনকে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনরূপে চিহ্নিতকরণের পক্ষপাতী। এই আন্দোলন ছিল শিক্ষার উন্নতিলাভের মাধ্যমে হীনমন্যতা দূর করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করে সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার অর্জনের আন্দোলন। তবে তারা একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এই আন্দোলনেও ধর্ম প্রেরণা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

নিম্নবর্গীয় আন্দোলনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হামজা আলভির বক্তব্য হল, "The historical process by which a class-in-itself is transformed into a class-for itself are complex and are mediated by a variety of factors, including influences of pre-existing forms of social organization and institution which embody primordial loyalties, such as those of kinship or ethnic identity etc, this is especially true on peasant societies, furthermore, given and hierarchical social order in peasant societies, the absence of horizontal political cleavages along class lines implies the existence of vertical cleavages which cut across class lines."[৫] ভারতীয় প্রেক্ষাপটে শ্রেণীগত চেতনা নয়, ধর্মীয় সংস্কার এই ধরনের আন্দোলনে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আসলে ধর্মীয় বিষয়টি এমনই যে শৈশব অবস্থা থেকে নানা ধরনের অনুশাসনের মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলে মনের গঠন এরূপ হয় যে সে আর কিছুতেই 'লক্ষণ রেখা' থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। মনের বিকাশ এমনভাবে ঘটে যে সে আর ধর্মের আবরণকে ছিন্ন করার মতো সাহসই সঞ্চয় করতে পারে না। ধর্মীয় চেতনায় আচ্ছন্ন ভারতীয়দের মানসিকতা উপলব্ধিপূর্বক এবং শিক্ষার অভাব ও দারিদ্রের দুর্বল যায়গা দিয়ে অনুপ্রবেশ করে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা ঔপনিবেশিক বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। অস্ট্রেলিয়ান সাহেব ডঃ সি. এস. মিডের মনেও সেই ইচ্ছাই হয়তো ছিল। কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর মিডের সাহায্যে শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করে নমঃশূদ্র সমাজকে কেবলমাত্র শিক্ষিত করে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন তাই নয়া স্বধর্ম ত্যাগ না করেও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গতিমুখ তিনি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে গুরুচাঁদ ঠাকুর ওড়াকান্দিতে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাতে শিক্ষার্থীরা ভীড় জমালেও প্রারম্ভে শিক্ষকের অভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। কারণ বর্ণ হিন্দুরা জাত্যাভিমানবশত এবং ধর্মশাস্ত্রানুশাসনের দ্বারা পীড়িত হয়ে সে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে অস্বীকার করেছিল। এতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর অবদমিত হওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়তর করে ঘোষণা করেছিলেন:

"অন্য জাতি শিক্ষা দেয় শুধু অর্থের জন্য
নমঃশূদ্রগণে করে মূর্খ মধ্যে গণ্য।
স্বজাতি শিক্ষক যদি মিলে কোনদিনে
তার হাতে শিক্ষা দিব আপন সন্তানে।"[৬]

চণ্ডাল জাতির সন্তান সন্ততিদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে গুরুচাঁদ ঠাকুর যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাতে চণ্ডাল জাতিভুক্ত মানুষেরা নিজেদের প্রচেষ্টায়, নিজেদের অর্থব্যয়ে, নিজ বাড়ীর জমিতে, নিজস্ব জাতিভুক্ত মানুষদের শিক্ষকতায় শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষতায় যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন। এই উদ্যোগে স্বতঃ প্রণোদিতভাবে সামিল হয়েছিলেন রঘুনাথ সরকার। তিনি ছিলেন অন্ত্যজ জাতিভুক্ত প্রথম শিক্ষক যিনি তাঁর নিজ জাতির শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য অগ্রবর্তী হয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরবাড়ীর পাঠশালায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন। এই পাঠশালাটি পরবর্তী সময়কালে মধ্যছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। গুরুচাঁদ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেছিলেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দত্তডাঙ্গার জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র গাইনের গৃহে যে ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষদের সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা কিভাবে রূপায়িত হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। সেই সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা অগ্রাধিকার লাভ করেছিল। আর এর অন্যতম প্রধান কারণ নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। সেখানে তিনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটিকে শতাব্দীর সেরা ভাষণরূপে চিহ্নিত করলেও অতিশয়োক্তি হবে না। গুরুচাঁদের অভিভাষণে যেন সকল বন্ধন, সকল শৃঙ্খলমোচনের এবং জ্ঞানৈশ্বর্যের প্রখর দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত হওয়ার চিরায়ত নির্দেশই প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি তাঁর জাতিভুক্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন:

"তাই বলি ভাই মুক্তি যদি চাই
বিদ্বান হইতে হইবে।
পেলে বিদ্যাধন দুঃখ নিবারণ
চিরসুখী হবে যবে।"[৭]

গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর বক্তব্যে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তা হল, নমঃশূদ্রদের মুক্তি, বৈষয়িক উন্নতি, দাসত্ব মোচন। এককথায় তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা হল বিকল্পহীন মাধ্যম। তাঁর এই উপদেশ নমঃশূদ্র মানুষেরা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল। অতঃপর নিজেদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। আর এ ব্যাপারে তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। নমঃশূদ্রদের গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তাতে ওড়াকান্দি, ঘৃতকান্দি, ঘোনাপাড়া, এককথায় প্রতিটি গ্রামে শিক্ষায়তন দর্শন করেছিল বাস্তবের মুখ। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর গুরুচাঁদের নেতৃত্বে ঈশ্বরচন্দ্র গায়েন কর্তৃক প্রদত্ত জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নমঃশূদ্রদের দ্বিতীয় বিদ্যানিকেতন। এরপরেই চতুর্দিকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক বাংলায় উচ্চবর্ণীয় একাধিক মনীষী বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষার প্রসারের জন্য। এই সমস্ত বিদ্যালয় ছিল প্রধান শহরকেন্দ্রিক। আরও স্পষ্ঠভাবে বলতে গেলে কলকাতা ও শহরতলীতেই এই সমস্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলিতে সাধারণত পড়ার সুযোগ পেত উচ্চবর্ণসম্ভূত মানুষদের সন্তানসন্ততিগণ। ব্যতিক্রম যে একেবারেই ছিল না সে কথা হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু হীনবর্ণসম্ভূত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। পরিমল কুমার রায়ের পরিভাষানুযায়ী, "মনীষীবৃন্দ স্কুল খুলেছেন, পড়ুয়া পেয়েছেন, শিক্ষকরা পড়িয়েছেন কিন্তু যে সব মূঢ় মূক - যাদের মুখে দিতে হবে ভাষা, ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, তারা তো সেখানে অনুপস্থিত। অথচ শিক্ষা ছিল তাদেরই একান্ত প্রয়োজন। স্কুল পরিমণ্ডলের কাছে বা দূরে এরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও বাণীর বেদীতলে স্থান নিতে পারে নি এই অন্ত্যজ সমাজের শিশুরা।[৮] তাই এরূপ মন্তব্য হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না যে, উচ্চবর্ণীয় মনীষীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা আন্দোলন বা শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস প্রকৃত অর্থে অন্ত্যজ জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের কোন কাজেই আসে নি। যাঁরা সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করতেন তাঁরা কোনভাবেই এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন নি। এই ধরনের সামাজিক বৈষম্যকে মুলোৎপাটিত করার লক্ষ্যে তাঁরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন অত্যন্ত সচেতনভাবে। বৈষম্যের ব্যথায় যাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। আর সে জন্যই অন্ত্যজ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য যত বেশি সম্ভব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকেই তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নিজ গৃহে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে কর্মযজ্ঞের সূচনা তিনি করেছিলেন তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্বশীল ছিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ একান্ন বছর সময়কালে গুরুচাঁদ স্বীয় উদ্যোগে এবং তাঁর অনুসারীদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় ১৮১২টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা প্রায় নজিরবিহীন। গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন খুব সম্ভবত একমাত্র মনীষী যিনি একজন ধর্মপ্রচারক হয়েও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

শিক্ষানুরাগী ও ধর্মপ্রচারক। মণিমোহন বৈরাগী লিখেছেন, "পৃথিবীতে এমন কোন ধর্মগুরু আছেন কি যিনি অন্ত্যজ বাংলার মুক্তিদাতা গুরুচাঁদ ঠাকুরের মতো বলতে পারেন, বিদ্যাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে; একমাত্র বিদ্যাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। ধর্ম মানুষের মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে ঠিকই কিন্তু ধর্ম কখনও মানুষের পেটের ক্ষুধা মেটাতে পারে না।"[৯] গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্ম ও শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হয়তো তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মুক্তির স্বাদ লাভ করে নি, কিন্তু যে সমস্ত নমঃশূদ্র মানুষ শিক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতে গুরুচাঁদ ঠাকুরের অবদান যে বিরাট ছিল সে কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর অনুসারীরা নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের উন্নতিকল্পে ইংরেজ শাসককুলের পৃষ্ঠপোষকতা ও বদান্যতার উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল ছিলেন। এমনকি সাম্প্রতিককালের কোন কোন লেখক এই মর্মে ইংরেজ শাসককুলের গৃহীত ভূমিকা সম্পর্কে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্বপন কুমার বিশ্বাস কুণ্ঠাহীনভাবে এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, "ভাগ্যিস আলোর মশাল হাতে এসেছিল সাতসাগর পেরিয়ে শাসক ইংরেজ।"[১০] তিনি আরও লিখেছেন, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ওড়াকান্দির প্রত্যন্ত গ্রাম প্রথম বিদেশী শাসকের অবস্থানে ধন্য হয়েছিল। কোন বিদেশী শাসকের পদার্পণে ওড়াকান্দি ধন্য হয়েছিল তার নামোল্লেখ এখানে নেই। অস্ট্রেলিয়ান সাহেব সি. এস. মিডের উল্লেখ তাঁর রচনায় রয়েছে। কিন্তু মিড সাহেব তো আর বিদেশী শাসক ছিলেন না, খ্রীষ্টান মিশনারীরূপেই তিনি মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বিধবা হোম ও বালিকা বিদ্যালয়ও গড়ে তুলেছিলেন। বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল মিস টাকের উপর। বালিকা বিদ্যালয় রূপে আলোচ্য সময়কালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল তালতলার বালিকা বিদ্যালয়। কেবলমাত্র বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় নয়, মিড সাহেব নমঃশূদ্রদের জন্য ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজী মাধ্যম উচ্চ বিদ্যালয়। গুরুচাঁদ ঠাকুর যখন বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে, প্রান্তিক পল্লীতে, শহরের উপকণ্ঠে কিংবা শহরের বক্ষঃস্থলে দাঁড়িয়ে শিক্ষাপ্রসারের মহান বাণী ও দুর্দম আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন তখন বাংলার এক প্রাতঃশ্মরণীয় ব্যক্তিত্ব পাড়ি দিয়েছিলেন অমৃতলোকের পথে। এই শিক্ষাদরদী মহান পুরুষটি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে বিদ্যাসাগরের তিরোধানে বিদ্যাসাগরীয় শিক্ষা আন্দোলন হারিয়েছিল তার বেগ ও বিশালতা এবং তা ধীরে ধীরে অস্তমিত হয়ে পড়েছিল। আর অন্যদিকে ১২৮৭ বঙ্গাব্দ থেকে গুরুচাঁদ ঠাকুর যে শিক্ষা প্রসার আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন তাই পরবর্তী দুই এক দশকের মধ্যেই দুর্বার গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল এবং ব্রাত্যজনেরা শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন ইতিহাসের পাদপ্রদীপের আলোকে। বিদ্যাসাগর নিম্নবর্ণীয় মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি এ বিষয়ে তিনি বিরোধিতা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি বলেছিলেন, "আমার বিনীত অভিমত এই যে, বঙ্গদেশে শিক্ষার প্রসারে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র বাস্তবায়িত উপায়ই আছে সেটা হল, সরকারের উচিৎ কেবলমাত্র উচ্চবর্ণীয়দের ভেতরই ব্যাপকভাবে শিক্ষাপ্রসারের প্রচেষ্টা চালানো। এটাই সত্যি যে, সোনার বেনিয়াদের (সুবর্ণবণিক) কিছু পরিবার উন্নত ও জনপ্রিয়, কিন্তু জাতের মানদণ্ডে ওদের শ্রেণী খুবই নিম্নস্তরের। আমি নিশ্চিত যে, ওই শ্রেণীর লোকের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ কেবলমাত্র গোঁড়া পণ্ডিতদের সংস্কারকেই নাড়া দেবে না, একই সঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা ও মানসম্মানও ক্ষুণ্ণ হবে।"[১১] স্বভাবতই বিষয়টি স্পষ্ট যে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা আন্দোলন ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষাপ্রসার আন্দোলনের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য বিদ্যমান। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা আন্দোলনের ফসল উচ্চবর্ণসম্ভূত মানুষেরাই ভোগ করেছিল অধিক পরিমাণে। ব্রাত্য, অগ্রজ শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল মাত্র। বিদ্যাসাগরের মহত্ব সংশয়ের অতীত। কিন্তু তাঁর শিক্ষা আন্দোলন সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল একটি নির্দিষ্ট পরিসরে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তার সুফল ভোগ করতে পারে নি। অভিজাত বর্ণ হিন্দুদের জাতপাতের রক্তচক্ষুর কোপানলে নিম্নবর্ণীয় ও নিম্নবর্গীয় মানুষের কাছে

তার দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল চিরতরে। "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ" -এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের শিক্ষা আন্দোলন। অথচ গুরুচাঁদ ঠাকুর কঠোর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন সেগুলির দ্বার উন্মুক্ত ছিল সমাজের নিঃস্ব, রিক্ত ও অধঃপতিত মানুষদের জন্য। নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে বিচার করলে এরূপ মন্তব্য হয়তো অতিরঞ্জিত হবে না যে, বিদ্যাসাগর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা প্রসার আন্দোলনের মধ্যে কেবলমাত্র মূলগত প্রভেদ ছিল তাই নয়। বাস্তবের কঠিন ও রূঢ় মাটিতে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য যখন অনেকাংশেই বিফল তখন গুরুচাঁদ ঠাকুর সাফল্যের জয়মাল্যে ভূষিত এবং তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নমঃশূদ্র মানুষদের মুক্তির অগ্রদূত রূপে।

গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর দূরদর্শিতা ও তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধির স্পষ্টতায় সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীশিক্ষা হল সামগ্রিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার এক অপরিহার্য অঙ্গ। আর সার্বজনীনভাবে গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির আদর্শ জনগণের মানসিক বুদ্ধির বিকাশে এবং চরিত্রগঠনে উন্নততর সহায়ক। তাই ব্যক্তিমানুষের শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপের অর্থ হল স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও স্ব-নির্দেশনায় শিক্ষাদান। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এই সুযোগের আদর্শে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। বলাই বাহুল্য গুরুচাঁদ ঠাকুর অত্যন্ত সচেতন প্রয়াসে শিক্ষার বৈষম্যকে, আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, লিঙ্গ বৈষম্যকে বিদূরীতকরণের ভাবনায়, সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সকলের জন্য শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। নারীর স্বাধিকারের প্রশ্নে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তীব্রভাবে। বস্তুতঃ গুরুচাঁদ ঠাকুর পরিচালিত আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনগত সর্বাত্মক সংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই নারীর স্বাধিকার আন্দোলন এক বিশিষ্ট তাৎপর্য ও গুরুত্ব লাভ করেছিল। পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশকে স্মরণ করেই ঠাকুর গুরুচাঁদ নিজমুখেই বলেছিলেন,

"শুনেছি পিতার কাছে আমি বহুবার
নারী ও পুরুষ পাবে সম অধিকার"

তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনের অর্জিত গভীর অভিজ্ঞতা ও নিবিড় মানবিক সংবেদনশীলতায় অনুভব করেছিলেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বেচ্ছাচারীর উপর নারীদের মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতার পরিণাম কি মারাত্মক এবং কতখানি নিগ্রহাত্মক হতে পারে। দূরদর্শী প্রজ্ঞায় তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, কোন সমাজ সংস্কৃতিতে শিক্ষার মূল্যবোধ কতটা নির্ভেজাল বা খাঁটি তা স্থির করা সম্ভবপর হয়- নারীকে শিক্ষার আওতাধীন করা হয়েছে কিনা তা যথাযথভাবে অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। নারী শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে তিনি কতখানি আগ্রহান্বিত ছিলেন তা নিম্নোক্ত পদ্যাংশে সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুটিত:

"নারীশিক্ষা তবে প্রভু আপন আলয়
শান্তি সত্যভামা নামে স্কুল গড়ি দেয়।"[১২]

এ প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের দলিত নেতা জ্যোতিরাও গোবিন্দরাজ ফুলের কথা উল্লেখ্য। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "While other reformers concentrated more on reforming the social institutions of family and marriage with special emphasis on the status and rights of women, Jyotirao Phule revolted against the unjust caste system under which millions of people had suffered for centuries. In particular, he courageously uphold the cause of the untouchables and took up cudgels for the poorer peasants. He was a militant advocate of their rights."[১৩] জ্যোতিরাও ফুলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নিজগৃহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। পরে ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে বহু প্রতিবন্ধকতা, বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি আরো দুটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (হান্টার কমিশন) গঠিত হয়েছিল তখন জ্যোতিরাও ফুলে কমিশনের কাছে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর শিক্ষার

বিস্তার সম্পর্কিত গৃহীত পদক্ষেপ: "A year after the institution of the female schools I also established an indigenous mixed school for the lower classes, especially the mahar and Mangs. Two more schools for these classes were subsequently added. I continued to work in them for nearly nine to ten years."[১৪] এখানে তিনি 'indigenous' বা দেশীয় মানুষ বলতে নিম্নবর্গীয়দেরই বুঝিয়েছেন। ফুলে যেমন মাহার, মাঙ্গদের মতো অধঃপতিত মানুষদের শিক্ষা উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তেমনি বাংলায় গুরুচাঁদ ঠাকুর 'চণ্ডাল' নামধারী মানুষদের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই ধর্ম, কর্ম, সমাজ-জীবন ও সাধন-ভজনে নারীশক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার দান করা হয়েছিল। জন্মচক্র, কর্মফল, ললাটলিখন ইত্যাদির দোহাই দানপূর্বক স্বার্থান্বেষী ও রক্ষণশীল মনুবাদীরা বৃহত্তর শুদ্রসমাজকে যেভাবে বঞ্চনা করেছিল, একই অপকৌশলে তারা সমাজে নারীকে অবহেলা ও উপেক্ষার চরম অবক্ষয়ে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছিল। ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণে তথা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিমণ্ডলে নারীরা যাতে কোনভাবেই অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে জন্য সুকৌশলে তাদের সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সমাজ শুদ্ধতার বিষয়টিকে অছিলা হিসাবে ব্যবহার করে। মতুয়া ধর্মতত্ত্বে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ বা লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টিকে কোনভাবেই স্বীকৃতি দান করা হয় নি। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় বিধানে নারীকে যারপরনাই হীন করে দেখানো হয়েছে। 'মনুসঙ্হিতা'-য় নারীকে শূদ্রাণী, নরকের দ্বার, পথে নারী বিবর্জিতা ইত্যাদি ঘৃণ্যব্যঞ্জক অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। এখানে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে যে, আধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে নারী সংস্পর্শ সর্বদাই পরিত্যাজ্য। নারীদের সম্পর্কে বৌদ্ধ সাহিত্য অনুসরণ করেছে মধ্যপন্থা। এখানে একাধারে নারী উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, আর অন্যাধারে নারী সম্পর্কে মর্যাদাহানিকর বক্তব্যও উপস্থাপিত। কিন্তু মতুয়া ধর্মে এর সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম লক্ষ্যনীয়। এখানে বলা হয়েছে, "করিবে গৃহস্থ ধর্ম লয়ে নিজ নারী।" মতুয়া তত্ত্ব দার্শনিকতায় গৃহী ব্রহ্মচারীর যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নয় – ইন্দ্রিয় বলই ধর্মাচরণের মূল লক্ষ্য। মতুয়া আদর্শে গার্হস্থজীবনে নারী সম্পর্কে সংযমের সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করে বলা হয়েছে "এক নারী-ব্রহ্মচারী ব্যতিক্রমে স্বেচ্ছাচারী।" গুরুচাঁদ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন, পুরুষ তার মনের গভীরে আষ্টেপৃষ্ঠে শিকড় গেঁড়ে থাকা স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিকতা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রিয়তা ও আগাসী আধিপত্যবোধকে কতটা সংযম করতে সক্ষম হয়েছে তা বুঝতে পারা যায় বিবাহ ও সংসারধর্ম পালনে নারীর মতামত প্রয়োগের অধিকার কতটা স্বীকৃতি পেয়েছে তা অনুধাবনের মধ্যে।[১৫] পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিবাহ সংক্রান্ত রীতিনীতি এবং পরম্পরাগত আচার আচরণের মধ্য দিয়েই উপলব্ধিকরণ সম্ভবপর যে পুরুষ তার যথার্থ জীবন সঙ্গিনী রূপে এবং দাম্পত্য তথা গার্হস্থ্য জীবনের সুখ, সৌভাগ্য ও সাফল্যের অংশীদার হিসাবে কতটা মান্যতা দান করতে পেরেছে।

পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ধারণা ছিল দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তাঁর কাছে বিষয়টি পরিষ্কার ছিল যে, সংসার জীবনে যৌন নীতিবোধ সংক্রান্ত নিয়মের নির্ণায়ক পুরুষ। অত্যন্ত সচেতনভাবেই পুরুষ নির্ধারণ করেছে নারীর ক্ষেত্রে সামাজিক নৈতিকতার মান। এই নৈতিক মানদণ্ডের উর্দ্ধে বিচরণ করে পুরুষ। কেননা তা পুরুষের উপর আদৌ আরোপিত হয় নি, বা হলেও সেই নিমনীতি একান্তই শিথিল। নারীদের বিশেষভাবে অসহায় বিধবাদের প্রতি অমানবিকতা ও সহানুভূতিহীনতা গুরুচাঁদ ঠাকুরের মনকে বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। তিনি নারীর বৃত্তি, উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর স্থান, রুচি ও শালীনতাবোধ, শিল্পনৈপুণ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে নারীর দক্ষতা, এমনকি তার দৈনন্দিন শুচিতা ও সাজসজ্জা বা পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতিও আগ্রহশীল ছিলেন সমানভাবে। সমাজে মেলামেশার সুযোগ, জনজীবনে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা এবং সমাজের উন্নতি বৃদ্ধিতে নারীর স্থান নির্ণয়ের কঠোর সত্যকে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলার আহ্বান জানিয়েই তিনি নারী জাগরণ – নারী প্রগতি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। বস্তুত মতুয়া আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল ধর্মীয় অনুভাবনায়। সেই পরম্পরার বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি না ঘটিয়ে তাঁর পূর্বসূরী ও জন্মদাতা হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক

মতুয়া আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী জাতিকে যথাযোগ্য সম্মান ও মূল্য দান করেছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। নারীসমাজের অশিক্ষা, কুসংস্কার, মূঢ়তা ও সামাজিক দুর্গতি অবলোকন করে তিনি তার প্রতিকার বিধানের জন্য সযত্ন প্রয়াসী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর যুগ বা কাল সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন বলেই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, বিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক চেতনায় যে পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত তার মূলে নিহিত রয়েছে পরিবার ও গৃহজীবনের প্রচলিত ধারার আমূল পরিবর্তন। উক্ত সময়কালে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হতে থাকে নারীমুক্তির চেতনা।[১৬] গৃহের চার দেওয়ালের বাইরে বিপুল জগতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সে সময় কর্মের জগতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছিল। তবে বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিল উচ্চবর্গীয় ও উচ্চবর্ণীয় মহিলাদের মধ্যে। গুরুচাঁদ ঠাকুর সে সম্পর্কে ছিলে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত নারীরা যাতে সমাজে ও সংসার জীবনে এগিয়ে যেতে পারে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে সে জন্য পারিপার্শ্বিকভিত্তিক উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মর্মে মর্মে। মতুয়া আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান গতির সঙ্গে সমানতালে তাল মিলিয়ে তিনি তাঁর বহুমুখী শিক্ষা সংস্কার প্রয়াসের মধ্যে নারীর স্বাধিকার ও নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি উল্লেখের দাবী রাখে তা হল গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই প্রয়াস অপতিক বা তাৎক্ষণিক আবেগতাড়িত ছিল না। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত সুচিন্তিতভাবে গ্রহণপূর্বক তিনি তার সমাজ ও শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনে নারীর স্বাধিকার ও নারীশিক্ষার বিষয়টি যুক্ত করেছিলেন।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া ধর্ম আন্দোলন যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছিল তাতে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে নারীর মূল্যবোধ নতুন করে এক উচ্চ স্থান লাভ করেছিল। বেদভিত্তিক নারীর মূল্যবোধ থেকে তারা এক নতুন জগতে প্রবেশ করতে পেরেছিল। ফলশ্রুতি হিসাবে অতীত ঐতিহ্য থেকে বিবর্তনের লক্ষণগুলি লাভ করেছিল সুস্পষ্ট রূপ। নারীদের আচার আচরণে পতিব্রতা হওয়ার বিষয়টি দ্বিমাত্রিক হয়ে উঠেছিল। পুরুষের সাথে সমান্তরালভাবে পথ পরিক্রমা করা ছাড়াও সাংসারিক দায় ও দায়িত্ব পালনই নারীর অন্যতম প্রধান কর্তব্যরূপে বিবেচিত হয়েছিল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ নারীদের সম্মুখে উন্মোচিত করে দিয়ে মতুয়া ধর্ম আন্দোলন হয়ে উঠেছিল নারীবাদের পূজারী। নারীদের শারীরিক সক্ষমতায় যতখানি দুর্বল ভাবা হয়েছিল, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের শ্রমক্ষমতা প্রমাণ করে দিয়েছিল এই ধরনের প্রচলিত বক্তব্য কেবলমাত্র ভ্রান্তিপূর্ণ নয়, তা সর্বৈব মিথ্যা। নারীদের নিয়ে অতীতের যে ভাবনা - নারীরা মূলত যৌনসঙ্গী - তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল গুরুচাঁদ ঠাকুর পরিচালিত মতুয়া আন্দোলন। যা অতীতে ছিল নারী জীবনের ভবিতব্য সেই গণ্ডীকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে পেরেছিলেন মতুয়া আন্দোলনকারীরা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠার যে প্রচেষতা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলারা চালিয়ে থাকেন তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদের যোগ্য। প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় এই সমস্ত মহিলারা পিছনের সারিতে হলেও যে কোন মতুয়া হরিসভায় কিংবা হরিকীর্তনে মহিলাদের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীভুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বক্তব্য কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়।

গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়াদের নিজস্ব উৎসব হিসাবে বারুণী মেলার প্রবর্তন করেছিলেন। ওড়াকান্দিতে অনুষ্ঠিত মহাবারুণীর মেলায় সমবেত ভক্তদের সম্মুখে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, মতুনা ধর্মাদর্শে কোন তীর্থভ্রমণ নেই, ছুঁৎমার্গ নেই, কোন জাতিভেদ প্রথা নেই, কোন জড় ঠাকুর দেবতা তথা কল্পিত দেব-দেবীর অস্তিত্ব নেই, দীক্ষারও কোন স্থান নেই, নেই পৈতেধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা কোন ক্রিয়াকর্ম। তিনি আরও বলেছিলেন, বেদ-বিধি বলে কোন কিছু নেই। বেদের মন্ত্র বা সূক্ত ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী হতে পারে না। মানুষই সবার উর্ধ্বে, তীর্থ পর্যটনের দ্বারা কোনপ্রকার পূণ্য অর্জন করা যায় না। বৈদিক আর্যগণ ছিলেন যে সমস্ত দেবদেবীর শ্রষ্টা সেই সমস্ত দেবদেবীর প্রতি গুরুচাঁদ ঠাকুরের কোনরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা বা আস্থা ছিল না। তিনি মতুয়া ধর্মানুসারীদের তাই কুণ্ঠাহীনভাবে এরূপ নির্দেশ দান করেছিলেন যে তারা যেন নিজেরাই মন্দির নির্মাণ করে এবং সেই মন্দিরে হরিচাঁদকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত তাঁর পূজার্চনা করে। মতুয়াদের পূণ্যার্জনের জন্য উচ্চবর্ণীয়দের কোন দেবতার

মন্দিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এইভাবে তিনি মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। এই মর্মে তাঁর বক্তব্য ছিল পরিষ্কার:

"তোমাদের এই কূলে হরি অবতার।
দয়া করে নমঃশূদ্র করিল উদ্ধার॥
তাঁর পূজা কর সবে তাঁর ভক্ত হও।
শ্রীহরি মন্দিরে তাঁর মূরতি সাজাও॥
মতুয়ার পক্ষে কোন পূজা পার্বন নাই।
শ্রীহরি মন্দিরে নিত্য পূজা করা চাই॥"[১৭]

প্রচলিত তত্ত্বানুসারে, মতুয়াধর্ম বেদ বিরোধী, যাগযজ্ঞ বিরোধী পুরোহিততন্ত্র বিরোধী, গুরু-গিরি বিরোধী ও জাতপাত বিরোধী। সাম্যময় প্রেমভাবনা এই ধর্মের মূলমন্ত্র। হিন্দুধর্মে শ্রমকে কখনোই সম্মান জানানো হয় নি। এই ধর্ম মানুষকে অন্ধ বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করেছে। ঈশ্বরমুখীনতা শ্রমবিমুখতার জন্ম দেয়, কিন্তু মতুয়া ধর্মে শ্রম সবিশেষ গুরুত্বে প্রতিভাত হয়েছে। "হাতে কাম মুখে নাম"- এই হল মতুয়া ধর্মের সারতত্ত্ব। মতুয়া ধর্মানুসারীদের জীবিকা ছিল কৃষিকাজ, মাছধরা, কাঠের কাজ, নৌকা প্রস্তুত করা, আবার অনেকেই ধনী বাড়ির লেঠেলের কাজ করত। গুরুচাঁদ ঠাকুরদেরও ব্যবসা ছিল নৌকা তৈরী। তিনি শ্রম বিমুখতাকে ঘৃণা করতেন তীব্রভাবে। তিনি হাতে কাম মুখে নাম করতে বলে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরকেই ছত্রতলে সামিল করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত, আর সেজন্যই এই সমস্ত অধঃপতিত মানুষদের শিক্ষা গ্রহণের প্ররোচনা দিয়ে তাদের বিদ্রোহী মানসিকতাসম্পন্ন করে তুলতে পেরেছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের একটি অংশকে সুশিক্ষিত করে দলিত জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। মতুয়া আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে এবং তারা সমাজের সব অংশের সমান দাবীদার হয়ে ওঠে। বলাইবাহুল্য এই কৃতিত্ব গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রাপ্য। মতুয়া আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসাবে তিনি নমঃশূদ্র জাগরণের অগ্রদূত।

পরিমল কুমার রায় লিখেছেন, "মতুয়াধর্ম হিন্দুধর্ম বহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। কিন্তু মতুয়াধর্মকে স্বতন্ত্র ধর্মরূপে চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ বা বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এরূপ মন্তব্য হয়তো অতিশয়োক্তি হবে না যে, মতুয়াধর্ম কোনভাবেই হিন্দুধর্মের শাখাধর্ম নয়। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, হিন্দুধর্মের অসাম্য, অমানবিকতা, জাতিভেদ প্রথা, ছুৎমার্গ ইত্যাদি বিষয়াদির কোন স্থান মতুয়াধর্মে নেই। তাছাড়া এই ধর্মের অভিনবত্ব যেমন আছে তেমনি এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও বর্তমান। প্রথমত, মতুয়াধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, একই সঙ্গে 'নাম ও কাম' অর্থাৎ ঠাকুরের নাম ভজনা ও কর্মসম্পাদনের অপরিহার্যতার কথা বলা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বাস্তবতার মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে মতুয়া ধর্মে। ভক্তদের উদ্দেশ্যে গুরুর মুখনিঃসৃত বাণী ছিল এরূপ:

"হরিনাম লও মুখে,
হাতে কাম কর সুখে।"[১৮]

কিন্তু একই সঙ্গে দুটি কাজ করা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? বোধ হয় নয়, কারণ মুখে বলা যতো সহজ কাজে করা ততোধিক কঠিন। দুটি পৃথম অঙ্গের মাধ্যমে একই সঙ্গে দুটি কর্মসম্পাদনে মনসংযোগ সুকঠিন বিষয়। নামে অ্যান্ড কামে একই সঙ্গে মনঃসংযোগ করতে হবে, আর তা না হলে কোনটিই সম্পন্ন হবে না। আর সম্পন্ন না হলে ফললাভের আশা দুরাশা মাত্র, কোন ব্যক্তিমানুষ তার একমাত্র মনকে একই সময়ে দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে পারে কি? বোধ হয় নয়, কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তা কোনভাবেই সম্ভবপর নয়, আধ্যাত্মিক জগতের মানুষেরা তা পারেন কিনা তাও সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্যের অতীত।

মতুয়া ধর্মে ব্রহ্মচারী শব্দের নতুন ব্যাখ্যা দান বা সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে:

"একনারী ব্রহ্মচারী পালো গৃহধর্ম।
গৃহধর্ম নষ্ট হলে নষ্ট সব কর্ম॥"

অর্থাৎ এই আজ্ঞানুসারে গৃহে বসেই পরিবারবর্গসহ ধর্মাচরণ সম্ভব। এই ধর্মে গৃহত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই। গৃহকর্ম বর্জনের প্রশ্নটিও এখানে অবান্তর। বনে-জঙ্গলে-পর্বতে-গিরিগুহায় গিয়ে সাধন-ভজনের অপ্রয়োজনীয়তার কথাও মতুয়া ধর্মে বলা হয়েছে। নারী ও পুরুষের মিলনেই প্রকৃতি সম্পূর্ণ, আর সে জন্যই নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। নারী ও পুরুষ যুগ্মভাবে সৃষ্টিকে রক্ষা করে চলে। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম পালন বা কৌমার্য রক্ষা সাধারণ মানুষের পক্ষে শুধু অকল্পনীয় নয়, তা একান্তভাবেই প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাই সহজ-সরল পন্থায় সংসার ধর্ম প্রতিপালন করে যাতে সাধারণ মানুষ ঈশ্বর আরাধনা করতে পয়ারে সেরূপ বিধানই দান করা হয়েছিল মতুয়া ধর্মে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, মানুষ কি সংসারধর্ম পালন করে কায়েমি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে? সাংসারিক দুঃখ কষ্ট বা সন্তান সন্ততিদের হিতাহিতের চিন্তা উপেক্ষা করে তার পক্ষে কি পরিপূর্ণ মাত্রায় ঈশ্বর আরাধনায় আত্মনিয়োগ সম্ভবপর? এতে কি মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে না? এইসব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া কিন্তু কঠিন ব্যাপার। তবে মতুয়াধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে, আর তা হল দীক্ষাদানের প্রয়োজনহীনতা। মতুয়া ধর্মে স্পষ্ট নির্দেশ দান করা হয়েছে যে, কর্ণে গুপ্ত মন্ত্রদানের কোন প্রয়োজন নেই। কোন গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে না। পূণ্যার্জনের জন্য তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণও প্রয়োজনহীন। নিজের গৃহকেই রূপান্তরিত করতে হবে তীর্থস্থানে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মতো মন্ত্রের ছড়াছবি মতুয়াধর্মে নেই।[১৯] এখানে একটি মাত্র মন্ত্র রয়েছে, আর সেই মন্ত্র হল 'হরিবোল'। তবে এই মন্ত্রেও মতুয়াধর্ম অভিনবত্বের দাবী করতে পারে না। এই মন্ত্রটিও মতুয়াধর্ম সৃষ্ট নয়, চৈতন্য আন্দোলনের অনুসরণমাত্র। যেখানে বলা হয়েছেঃ "হরিনাম, হরিনাম, হরিনামৈব কেবলম।" 'হরিবোল' মন্ত্রে যদি মাহাত্ম্য বা মাদকতা থেকেও থাকে তবে তা কি সাধারণ মানুষের বোধগম্যের অতীত নয়? ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পার্থিব জগতে যা কিছু ঘটে থাকে তার কোনটিই অলৌকিক নয়, সবই লৌকিক মাত্র।

তত্ত্বগতভাবে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাই হল মতুয়াধর্মের ভিত্তি। এখানে ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ কোন ভেদাভেদ নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষই এখানে সমানাধিকারী এবং সমাজ স্থান লাভে সক্ষম। সকলের সঙ্গে মৈত্রী, সবার প্রতি সদ্ব্যবহার, প্রেম ও ভালোবাসার শিক্ষা দান করে মতুয়া ধর্ম। এখানে রয়েছে স্বাধীনতা বা মুক্তির দিশা, এখানে কেউ কারো দাস নয়, কেউ কারো প্রভু বা মালিকও নয়। বলাইবাহুল্য এই সমস্ত কিছুই তত্ত্বকথামাত্র। নমঃশূদ্র ব্যতিরেকে অন্য জাতি-বর্ণ বা সম্প্রদায়ের দায়ভুক্ত মানুষের অনুপ্রবেশ মতুয়াধর্মে ঘটেছিল বলে মনে হয় না, হয়ত বর্ণ বিভাজন এখানে ছিল না, কিন্তু শ্রেণীগত বিভাজনকে মতুয়াধর্ম কি উপেক্ষা করতে পেরেছিল? বস্তুতপক্ষে মতুয়াধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেবত্ব পর্যায়ে উন্নীতকরণের প্রচেষ্টা সচেতনভাবেই চালানো হয়েছিল। হরিচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তিনি পূর্ণ অবতার, তিনি মানবদেহী ঈশ্বর, তিনিই একমাত্র উপাস্য ও আরাধ্য। তাঁকে স্মরণ করলেই পরমেশ্বরের আরাধনা, পূজা ও স্মরণ করা হয়। তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পন করলেই ঈশ্বরের পাদপদ্মে আত্মসমর্পন করা হয়। হরিচাঁদ ঠাকুর মানবদেহী ঈশ্বর ছিলেন কি না সে বিতর্কে না গিয়ে এ কথা বলা যেতে পারে যে, মতুয়া ধর্মানুসারীরা কেবলমাত্র তাঁকে নয়, গুরুচাঁদ ঠাকুরকেও দেবতার আসনে বসিয়েছিল। পিতা-পুত্রকে বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, যিশুখ্রিস্টের সমগোত্রীয় রূপেই প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষান্ত হয়নি। হরিচাঁদকে বলা হয়েছিল, "Incarnation – a living embodiment of a good." আসলে মতুয়া ধর্মাবলম্বীরা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে তাদের জয়গান করতে এবং ধূপধুনো দিয়ে পূজা করতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। কেবলমাত্র অশিক্ষিত ও ধর্মান্ধ মানুষেরাই নয়, এই ধরনের ভাবধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছেন শিক্ষিত মানুষেরাও।[২০] তারা হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী শোনাতে অনেক বেশি আগ্রহী। আসলে প্রজ্ঞার অধিকারী হলে মানুষ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং অনাগত ভবিষ্যতের একটি ছবি তাদের সম্মুখে ফুটে ওঠে অর্থাৎ তারা ভবিষ্যতদ্রষ্টা হয়ে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ দূরদর্শিতার অভাবে বাস্তবকে

মানতে চায় না। তারা অলৌকিম ধ্যানধারনায় অবগাহন করে অনেক বেশি আনন্দ পেয়ে থাকেন। মতুয়া ধর্মানুসারীদের মধ্যেও এর কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না, আর তাই হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রকৃত উদ্দেশ্য আজও পরিপূর্ণতা লাভ করে নি।

দলিত জাগরণের মূল হোতা কে? – গুরুচাঁদ ঠাকুর নাকি বাবাসাহেব আম্বেদকর? – এই ধরনের বিতর্কে মতুয়া ধর্মবিশ্বাসী ও আম্বেদকরপন্থীরা জড়িয়ে পড়েন। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের আদর্শে সমৃদ্ধ মতুয়াধর্মের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছে অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের মুক্তির দূত বাবাসাহেব ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের সমুন্নত ও সুচিন্তিত ভাবাদর্শের। গুরুচাঁদ ঠাকুর আবির্ভুত হয়েছিলেন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আর ডঃ আম্বেদকরের আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। একজন বাংলা অর্থাৎ পূর্ব ভারতে আর একজন মহারাষ্ট্র অর্থাৎ পশ্চিম ভারতে অবস্থান করতেন। তাঁদের মধ্যে দেশ ও কালের ব্যবধান অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাঁদের কর্মজগৎ, উদ্দীপনা, চিন্তাভাবনা ও চেতনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল অভিন্ন। মতুয়াধর্ম সৃষ্ট হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের ধারাবাহিকতা ও পরম্পরাকে কেন্দ্র করে- এরূপ ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে দান করে থাকে মতুয়াধর্মের আকর গ্রন্থ 'লীলামৃত'-এ এখানে বলা হয়েছে:

"বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণর জন্য
যশোবন্ত গৃহে হরি হৈল অবতীর্ণ।"[২১]

বৌদ্ধধর্মের উপর মতুয়াধর্মের প্রভাব যেমন ব্যাপক তেমনি ডঃ আম্বেদকরও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন দারুণভাবে। তিনি বৌদ্ধধর্মের আদর্শকে অনুসরণ করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সুস্থ সমাজ ও সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে। জীবনের প্রাক-গোধূলি লগ্নে তিনি হিন্দুধর্মকে চিরবিদায় জানিয়ে বৌদ্ধধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে। এই মর্মে তাঁর বক্তব্য ছিল পরিষ্কার, "বৌদ্ধধর্ম উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ- সাম্য, মৈত্রী ও করুণা। পরমতসহিষ্ণুতা থাকায় এবং শ্রেণীভেদ না থাকায় এই ধর্মের মানুষ অতি সহজে অন্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবার যদি ভারতবাসী বুদ্ধের আদর্শ গ্রহণ করে তবে ভারতে পুনরায় প্রেম, ভালোবাসা ও ন্যায় বিচারের সমুন্নত সমাজ গড়ে উঠবে।"

ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী নীতি-নির্দেশনাই মতুয়া ধর্মের দর্শন যেখানে বলা হয়েছে যে, সমাজে সকল প্রকার শোষণ ও নিপীড়নের মাধ্যম হল ব্রাহ্মণ্যের যাগযজ্ঞ, তন্ত্রমন্ত্র, ভেকঝোলা। কল্পিত ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়ে তারা স্বর্গ, নরক, ইহকাল, পরকাল ইত্যাদির সৃষ্টি করেছে। সচেতনভাবে নিজ সৃষ্ট দেবদেবীর নামে ভয় দেখিয়ে ব্রাহ্মণরা দরিদ্র-নিরক্ষর মানুষদের ধন-সম্পদ অপহরণ করেছে। ডঃ আম্বেদকরের বক্তব্যেও সমগোত্রীয় মন্তব্যের প্রতিফলন লক্ষ্যনীয়। তিনি বলেছিলেন, হিন্দু দেবদেবীর স্রষ্টা ব্রাহ্মণরা। দেবদেবীর মূর্তিকে সাক্ষীগোপাল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিতকরণের মাধ্যমে ব্রাহ্মণরা সুকৌশলে চালিয়ে যায় অবাধ লুণ্ঠন। ব্রাহ্মণ্যবাদসঞ্জাত শাসন-শোষণই নির্যাতিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা ও সামাজিক নিপীড়নের অন্যতম প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণ্যবাদ তিনটি মূল নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত – অসাম্য, বিভেদ ও শোষণ। ব্রাহ্মণ্যবাদই অস্পৃশ্যতার জনক। আজ প্রয়োজন সমস্ত নির্যাতিত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষদের একই ছত্রতলে সামিল হয়ে ভারতবর্ষের মাটি থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের মূলোৎপাটন, আর তা না হলে এই সমস্ত পশ্চাদপদ মানুষেরা তাদের নিজস্ব অধিকারের দাবীতে কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

মনুসংহিতায় নারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে নরকের দ্বাররূপে। সেখানে বলা হয়েছে পুরুষকে কলুষিত করাই নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। নারী সংস্পর্শে স্খলিত হয় পুরুষের ব্রহ্মচর্য। মতুয়াধর্ম আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে গুরুচাঁদ ঠাকুর এই বিধান কেবলমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন তাই নয়, তিনি এই মর্মে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী নারীকে সঙ্গে নিয়েই সুসংযত গার্হস্থ ধর্ম প্রতিপালন করতে হবে। পরপুরুষ বা পরনারীর প্রতি যেন দুর্বলতা না থাকে। বহুগামিতা যে কোন মূল্যে পরিহার করতে হবে। নিজের স্ত্রীকেই সাধন

সঙ্গিনী করতে হবে। গুরুচাঁদ ঠাকুর মনুসংহিতার বিধানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ডঃ আম্বেদকর ছিলেন অনেক বেশী আক্রমণাত্মক। তিনি প্রকাশ্য সমাবেশে মনুসংহিতাকে পুড়িয়ে ফেলতেও কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ব্রাহ্মণ্যবাদী অনিষ্টকর অনুশাসনের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছিলেন সমগ্র জীবনব্যাপী। বাবাসাহেবের বক্তব্য ছিল স্ত্রী স্বামীর দাসী নয় বা তা হতেও পারে না। সে তার স্বামীর সহধর্মিণী, জীবনসঙ্গিনী, কেবলমাত্র শয্যাশায়িনী নয়। তাই মর্যাদার দিক দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই, উভয়েরই মর্যাদা সমান। নারীদের যারা হেয় বলে প্রতিপন্ন করেছে তারা কেবলমাত্র নারীদের নয়, সমগ্র মানবসমাজের শত্রু। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন, "নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বহুবিবাহ প্রথা রদ করা। কোন সরকারী বা আধা-সরকারী কর্মচারী, সংসদ সদস্য বা বিধায়ক একাধিক বিবাহ করতে পারবে না, করলে তাদের সদস্যপদ বা চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।"[২২]

গুরুচাঁদ ঠাকুর শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, বিদ্যাই মনুষত্ব বিকাশের সর্বোত্তম সহায়ক। সমগোত্রীয় বক্তব্যের অনুরণন ডঃ আম্বেদকরের মন্তব্যে লক্ষ্যনীয়। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষা মানুষের শোষণ মুক্তির শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই একমাত্র ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের দ্বারা জনগণকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। শিক্ষাই শক্তির মূল উৎস। জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই সমাজে নেতৃত্ব দান করে থাকেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর ভেবেছিলেন, শিক্ষার সঙ্গে যুবক সম্প্রদায়ের চাকুরির প্রয়োজনীয়তাও অপরিহার্য। হতাশার অন্যতম প্রধান কারণ হল বেকারত্ব। তদুপরি শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হলে দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে স্বাভাবিক কারণেই। ডঃ আম্বেদকরও সরকারী চাকুরির দাবীতে প্রথম থেকেই ছিলেন সরব। তিনি বলেছিলেন, তফসিলী ও আদিবাসী জাতিসমূহের সংখ্যানুপাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাকুরিতে ন্যায্য অংশগ্রহণের ব্যবস্থা আইনানুগ করতে হবে। গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রথমাবধি এই মর্মে সচেতন ছিলেন যে, সমাজ সংস্কার কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে গেলে মানুষকে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন ও আন্দোলনের মাধ্যমে জনমত গঠন সম্ভবপর। সভা সমিতি, আলোচনা, সমাবেশ সংগঠনের মধ্য দিয়ে পশ্চাদপদ মানুষদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হলেই বিপ্লবের অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে। আর বিপ্লব বাস্তব রূপ লাভ করলেই সমাজের পরিবর্তন অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। ঠিক একইভাবে শিক্ষা, সংগঠন ও আন্দোলন ছিল ডঃ আম্বেদকরের তিনটি মন্ত্র। তিনি বলতেনঃ সংগ্রামই শক্তির উৎস। অন্তহীন, নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভবপর। শিক্ষা, সংহতি, ও সংগ্রামী ঐক্যই কেবলমাত্র দলিত ও শোষিত মানুষদের মুক্তি আনতে পারে।[২৩] আর্থিক উন্নতি অপেক্ষা আত্মমর্যাদা অধিকতর মূল্যবান। তাই অধঃপতিত মানুষের সংগ্রাম আত্মমর্যাদা অর্জন ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সংগ্রাম।

গুরুচাঁদ ঠাকুর সুদীর্ঘ সময়কালব্যাপী লক্ষ্য করেছিলেন। নিরক্ষর, দরিদ্র, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয় মেয়ের বিয়ে, পিতামাতার শ্রাদ্ধে সাধ্যের অতীত ব্যয় করে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরকালে সুখলাভের অলীক কল্পনায় বাস্তব জীবনের সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে তারা ব্রাহ্মণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করে থাকে। আত্মা, পরমাত্মা, ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি বিষয়ের বিরুদ্ধে বাবাসাহেব বিষোদ্গার করেছিলেন তীব্রভাবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ, দশবিধ সংস্কার ইত্যাদি হল ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণযন্ত্র। মন্দির, তীর্থস্থান, ধর্মক্ষেত্র শোষণের কারখানা। পুরোহিতরা হিন্দু সমাজের রক্তচোষা বাদুড়। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পরোহিততন্ত্রের অস্তিত্বশীলতার মূল কারণ হল প্রচলিত কুসংস্কার। আর চরম কুসংস্কার হল আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। ঈশ্বর বিশ্বাসী হওয়ার চেয়েও আত্মার অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন সর্বাধিক ক্ষতিকারক। পূর্বজন্ম, পরজন্ম, অদৃষ্টবাদ, দুঃখবাদ ইত্যাদি অলীক কল্পনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতি ঘটাতে হলে এই সমস্ত চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে সদাসর্বদাই। গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছিলেন, যে জাতি হাজার বছর ধরে সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম ও রাজনৈতিক দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ সেই

জাতির মুক্তির জন্য ত্যাগ স্বীকার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। জীবন অপেক্ষা জাতিকে ভালোবাসতে হবে অধি পরিমাণে।[২৪] ডঃ আম্বেদকর অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, "আমার কাছে আমার জীবন অপেক্ষা আমার দেশের স্বার্থ অনেক বড়। আমার অসহায় ও নির্যাতিত অস্পৃশ্য সমাজের স্বার্থ তার চেয়েও বড়। তিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তার উন্নতির জন্য শ্রম, সময় ও অর্থ দান করেছেন, তাঁর জন্ম সার্থক এবং তিনি মানবসমাজে গৌরবান্বিত।"

গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মুক্তি এবং তার বস্তুগত জীবনে যে সমস্ত সমস্যা জগদ্দল পাথরের মতো দণ্ডায়মান সেইসব সমস্যার একমাত্র পথ হল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। এই মর্মে তাঁর মনে কোনরূপ সংশয় ছিল না যে রাজশক্তি হল শ্রেষ্ঠশক্তি, ক্ষমতা, সম্মান, মান-মর্যাদা অর্জনের অন্যতম প্রধান সোপান। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়েই দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণসাধন সম্ভবপর। তিনি বলেছিলেন:

"ধর্মের পালক রাজা জানিবে নিশ্চয়।
রাজশক্তি বিনা কিছু বড় নাহি হয়॥
জাতিধর্ম যাহা কিছু উঠাইতে চাও।
রাজশক্তি থাকে যদি যাহা চাও পাও॥"

রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের প্রশ্নেও গুরুচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্যের সঙ্গে ডঃ আম্বেদকরের বক্তব্যের ব্যাপক সাদৃশ্য লক্ষ্যনীয়। বস্তুতপক্ষে শুধু সমগোত্রীয় নয়, যেন একই মন্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়েছিল উভয়ের কণ্ঠে। বাবাসাহেব বলেছিলেন, "Capture the temple of power for your emancipation." তাঁর পরিভাষানুযায়ী, "Political power is the master key by which you can open each and every lock." অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা হল প্রধান চাবি যার দ্বারা তুমি প্রত্যেকটি তালা খুলে ফেলতে পারবে। বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, এই দুই যুগনায়কের ভাবনা-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু একই ধারায় প্রবাহিত। বাংলা তথা ভারতবর্ষের দলিত, পতিত, অনগ্রসর, পশ্চাদমুখীনতাসর্বস্ব সমাজের মুক্তি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে গুরুচাঁদ ঠাকুর ও ডঃ আম্বেদকরের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের স্বার্থকতা অবশ্য স্বীকার্য্য তাই একথা বলতে বাধা নেই যে এদের মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ ছিল না। এরা ছিলেন একে অপরের সম্পূরক। দলিত জাগরণ ঘটানোর আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টা তাঁরা উভয়েই চালিয়েছিলেন- এ সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু তাদের অনুসৃত পথ ছিল পৃথক। উভয়েই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের সুশিক্ষিত করে দাবী আদায়ের জন্য তাদের সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা উভয়েই আংশিকভাবে সফল। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর পরিচালিত মতুয়া আন্দোলনকে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিপ্লবরূপে চিহ্নিতকরণ যথাযথ হবে না। একধাপ এগিয়ে বলা যেতে পারে যে, এটি ছিল দলিত মুক্তি আন্দোলনের সোপান।[২৫]

এদেশের উচ্চবর্ণসম্ভূত মানুষেরা মতুয়া আন্দোলনকে কেবলমাত্র নমঃশূদ্রদের আন্দোলনরূপে চিহ্নিত করে এই আন্দোলনের গুরুত্ব হ্রাসের প্রচেষ্টায় যত্নবান। কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর শিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুশদের নয়, তেলি, মালী, কুম্ভকার, কাপালি, মাহিষ্য, যাদব, দাস, চর্মকার, কর্মকার, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, মালাকার, তন্তুবায় এমনকি মুসলমানদেরও একই ছত্রতলে সামিল করেছিলেন। মতুয়াদের এই শিক্ষা আন্দোলনের সদর্থক প্রতিক্রিয়ায় যখন প্রায় সমগ্র বাংলার পতিত তথা অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের মনে এক আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছল, ঠিক সেই যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুর তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন বঙ্গ নমঃশূদ্র মহাসম্মেলনের মঞ্চ। এই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তাঁর কণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল নিম্নোক্ত পদ্যাংশে:

"কিবা বিদ্যা কিবা ধনে কি শিল্পে কি বিজ্ঞানে
রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজ কাজে।
সবখানে থাকা চাই তা ভিন্ন উপায় নাই
রাজবেশে সাজ রাজ সাজে।"

গুরুচাঁদ ঠাকুর পরিচালিত শিক্ষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নমঃশূদ্র গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল নতুনতর জীবন জিজ্ঞাসা। এসেছিল নতুন জীবন গঠনের ইঙ্গিত। আধুনিক জীবনের প্রয়োজনে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ সমস্ত কাজেই অগ্রসর হয়েছিল- ঠাকুর, ব্যবসা ও অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা রেখেছিল প্রতিভার সাক্ষর। মতুয়া আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি হিসাবে সৃষ্টি হয়েছিল মতুয়া সাহিত্য। যশোহরের তারক সরকার হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনকাহিনী নিয়ে রচনা করেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' শীর্ষক গ্রন্থ। মতুয়ার আদর্শ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল পরিষ্কার। মতুয়াদের ত্রিবিধ গুণের কথা তিনি বলেছিলেন – জীবে দয়া, নামে রুচি, মানুষেতে নিষ্ঠা। মহানন্দ হালদার গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবনচরিত নিয়ে রচনা করেছিলেন 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' নামক গ্রন্থ। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' ও 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়কে অতি সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারে মতুয়া আন্দোলনের তত্ত্বরক্ষকরূপে। মতুয়া চরিত সাহিত্য যেমন রচিত হয়েছিল তেমনি সৃষ্টি হয়েছিল মতুয়া পদগীতি সংকলনের ধারা। প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত কবিগণ সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় অধিক পরিমাণে রচনা করেছেন মতুয়া সঙ্গীত ও কবিগান। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কবিদের ৬১টি সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নমঃশূদ্র জাতিভুক্ত মানুষের দ্বারা রচিত প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটি হল 'শ্রীশ্রীমহাসংকীর্তন', রচয়িতা কবি তারকচন্দ্র সরকার। মধ্যযুগীয় বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য যেমন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছিল অনুরূপভাবে মতুয়া সাহিত্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংযোজিত করেছে নতুন মাত্রা।

গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন করে তোলার ব্যাপারে ছিলেন বদ্ধপরিকর। মতুয়া আন্দোলনের ফলে নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল তাই নয়, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণের বহিঃপ্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। 'The All India Depressed Classes Association' বা 'সারা ভারত অনুন্নত শ্রেণী সংস্থা' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে উত্তরপ্রদেশের স্বামী অচ্যুতানন্দ সর্বভারতীয়ভাবে অনগ্রসর ও অধঃপতিত মানুষদের নিয়ে প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। বাংলাতেও তার তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল। বাংলার রামকিঙ্কর রায়, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, ভীষ্মদেব দাস, ধনঞ্জয় রায়, ডাঃ মোহিনীমোহন দাস, রসিকলাল বিশ্বাস, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখ এই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[২৬] বলাই বাহুল্য নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের রাজনৈতিক জাগরণের আন্দোলন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বাংলা তথা ভারতবর্ষের যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষদের জাগরণের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবের কথাটিও ইল্লেখের দাবী রাখে। বাংলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা যারা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করেছিলেন তাঁরা অচিরেই উপলব্ধি করেন যে, তাঁরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অন্যায় অবিচারের শিকার। অর্থনৈতিক দি দিয়ে তাঁদের পশ্চাদগামীতার কারণ বর্ণহিন্দুদের নিরবিচ্ছিন্ন শোষণ। স্বভাবতই এই অবস্থা থেকে কিভাবে মুক্তি লাভ সম্ভব তার প্রতিকারের নানা পথানুসন্ধানে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃবৃন্দ কেবলমাত্র নিজেদের জাতিভুক্ত মানুষদের কথাই ভেবেছিলেন তাই নয়, তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষের অনগ্রসর মানুষদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা আরম্ভ করেছিলেন গভীরভাবে। অধঃপতিত অবস্থা থেকে তাঁরা কিভাবে মুক্তিলাভ করতে পারবে এবং তাঁদের সম্মুখে যে সমস্ত সমস্যা জগদ্দল পাথরের মতো দণ্ডায়মান সেগুলির সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করেছিলেন সচেতনভাবে। এইভাবে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের সামাজিক গণ্ডীর ঊর্ধ্বে বিচরণপূর্বক সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য যে আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন তা চরিত্রগতভাবে পরিগ্রহ করেছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ।

তথ্যসূত্র:

(১) ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, *'মতুয়া ধর্মঃ তত্ত্ব ও দর্শনে,* সন্তোষ কুমার বারুই (সম্পাঃ), ঠাকুর শ্রীশ্রীহরিচাঁদ মানব পুরুষঃ আধ্যাত্ম পুরুষ, দুর্গাপুর, ২০১১, পৃঃ ২৬।

(২) ডঃ করুণাসিন্ধু দাস, *'ঠাকুর শ্রীশ্রীহরিচাঁদের শিক্ষা ও সমাজ ভাবনা প্রসঙ্গে',* ঐ, পৃঃ ৩।

(৩) মহানন্দ হালদার, *"শ্রীশ্রীগুরুচাঁদচরিত',* কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১০৮।

(৪) রণজিৎ গুহ, *'নিম্নবর্গের ইতিহাস',* গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাঃ), নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ৪৩।

(৫) হামজা আলাভি, *'Peasant Classes and Primordial Loyalties',* The Journal of Peasant Studies, Vol-I, October, 1973, P.29.

(৬) মহানন্দ হালদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪।

(৭) ঐ।

(৮) পরিমল কুমার রায়, *'রাজর্ষি গুরুচাঁদ ও তাঁর শিক্ষা আন্দোলন',* চাকদহ, নদীয়া, বৎসর অনুল্লেখিত (No Date), পৃঃ ৯।

(৯) মণিমোহন বৈরাগী, *'অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম',* কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ১২।

(১০) স্বপন কুমার বিশ্বাস, *'হরি-গুরুচাঁদ, বাংলার চণ্ডাল ও ভারতবর্ষের বহুজন অভ্যুত্থান',* ওরিয়ন বুক, দিল্লী, ২০০২, পৃঃ ৯৯।

(১১) বিদ্যাসাগরের উদ্ধৃতি পরিমল কুমার রায়ের রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর শিক্ষা আন্দোলন শীর্ষক পুস্তিকার প্রচ্ছদ থেকে উদ্ধৃত।

(১২) মহানন্দ হালদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩।

(১৩) নন্দদুলাল মোহান্ত, *'মতুয়াতত্ত্ব দর্শন - নারী স্বাধিকার',* চতুর্থ দুনিয়া, আগস্ট, ২০০৯, পৃঃ ৩৯।

(১৪) ঐ, পৃঃ ৪০।

(১৫) কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর সম্পাদিত *'চতুর্থ দুনিয়া'* - মহাপ্রাণ শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০০৩, পৃঃ ১৩০।

(১৬) নরেশ চন্দ্র দাস, *'নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ', ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ১৬২-৬৩।*

(১৭) তারক চন্দ্র সরকার, *'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত',* কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ২২ - ২৩।

(১৮) অমর বিশ্বাস, *'মতুয়াধর্মের অভিনবত্ব ও দুর্বলতার সন্ধানে',* চতুর্থ দুনিয়া, আগস্ট, ২০০৯, পৃঃ ৯৪।

(১৯) সদানন্দ বিশ্বাস, *'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, বঙ্গভঙ্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ',* কলকাতা, ২০০৪, পৃঃ ১২।

(২০) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *'নমঃশূদ্র আন্দোলন'* ডঃ চিত্ত মণ্ডল ও ডঃ প্রথমা রায় মণ্ডল (সম্পাঃ), বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ২০২ - ০৩।

(২১) তারকচন্দ্র সরকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

(২২) B.R. Ambedkar, *'Writings and Speeches',* Vol.-VIII, P. 358-59.

(২৩) ঐ।

(২৪) শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, *'এ দেশের রাজনীতি ও বহুজন সমাজ',* কলকাতা ২০০০, পৃঃ ২৮২।

(২৫) নন্দদুলাল মোহান্ত, *'মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ',* কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ২৯৪-৯৯।

(২৬) কিরণ তালুকদার, *'জননায়ক মুকুন্দবিহারী মল্লিক',* কলকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ৬৪।